পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ

বিজয় উল্লাস ২০১৯

বিজয়ের পতাকা
উড়ছে সারা দেশে
মাতো বাঙালি
বিজয়ের উল্লাসে

ওরা দেখিয়েছে বিজয়ের সূর্যোদয়!

সেই সূর্যের আলো থাকুক চির অম্লান এই আমাদের প্রত্যয়

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

বাংলাদেশ স্মার্ট ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিঃ

বাংলাদেশ স্মার্ট ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিঃ এর সুবিধাসমূহ

১ এ কোম্পানির মাধ্যমে উৎপাদিত স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানী করা যাবে।

২. এ কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন পদে নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে বেকার সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।

৩. এ কোম্পানির মাধ্যমে উৎপাদিত স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার বাংলাদেশে সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে সহজে সরবরাহ করা যাবে। ফলে আমদানী সময় ক্ষেপন হবেনা।

৪. উৎপাদিত স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহারের ফলে স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার বিদেশ থেকে আমদানী করার প্রয়োজন হবে না। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

৫. বাংলাদেশ কারিগরি জ্ঞান অর্জনে স্বনির্ভর হবে এবং এধরণের মিটারে কোনত্রুটি দেখা দিলে দেশীয় জনবল দ্বারা মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

৬. স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ধারাবাহিকভাবে উৎপাদনের ফলে Scale of Economies অর্জিত হবে এবং প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হবে। ভবিষ্যতে সম্মানীত বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে স্বল্প মূল্যে স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

৭. এ কোম্পানির অর্জিত মুনাফা দ্বারা ভবিষ্যতে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং মুনাফার অবশিষ্ট অংশ সরকারি রাজস্ব খাতে জমা হবে।

৮. বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এ কোম্পানি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠগণ

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মতিউর রহমান

ক্যাপ্টেন
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সিপাহী
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

ল্যান্স নায়েক
মুন্সি আব্দুর রউফ

ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ

সিপাহী
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

স্মরণিকা কমিটি

প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (ইএসসি এন্ড এস)
আহবায়ক, স্মরণিকা কমিটি

প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডি
সদস্য সচিব, স্মরণিকা কমিটি

এ এন এম মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

মোঃ মোখলেছুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

মোঃ নাজমুল হুদা
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

প্রকৌশলী মোঃ মতিউর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড প্রটেকশন
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

বিজয়ের পতাকা উড়ছে সারা দেশে মাতো বাঙালি বিজয়ের উল্লাসে

বাণী

মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আমি ওজোপাডিকো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকের এ দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা পায়। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদকে, স্মরণ করছি দুই লক্ষের অধিক সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন স্বদেশভূমি পেয়েছি। সেই সাথে এসেছে আমাদের মহান বিজয় দিবস-১৬ই ডিসেম্বর। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে আরও অর্থবহ করতে ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আগামী দিনের বাংলাদেশ হোক জাতির পিতার কাঙ্খিত সোনার বাংলা যেখানে সকলের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার থাকবে অবারিত।

প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা।

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর জাতীয় মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাষনের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীর মুক্তির ঘোষণা ফুটে উঠে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় দুইশত বছরের উপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল ভেঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

৪৮তম মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষে গৃহীত কর্মসূচির আওতায় একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওজোপাডিকো কর্তৃপক্ষ। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে "বিজয় উল্লাস-২০১৯" স্মরণিকায় যাঁরা লেখা দিয়েছেন, তাঁরা কেউই পেশাদার লেখক নন এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে এ স্মরণিকাটি প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই সকলকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আগামী দিনে বর্ধিত কলেবরে আরও পরিশীলিত আকারে আপনাদের সহযোগিতায় স্মরণিকা প্রকাশের ইচ্ছা রইল। স্মরণিকা সম্পাদনা কমিটিসহ এ প্রকাশনায় লেখা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন-তাঁদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সম্পাদক স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি
ও
প্রধান প্রকৌশলী (ইএসসিএন্ডএস),
ওজোপাডিকো

সূচীপত্র

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	০৬
বিজয় স্মরনিকা	০৭
মুজিব বর্ষ	০৭
মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধু	০৮-১০
১৬-ই ডিসেম্বর	১১
এগিয়ে চলা	১১
ডায়মন্ড	১২-১৩
মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পিতা-মাতার ভূমিকা	১৪-১৫
কোরানের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য	১৬-১৭
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৮-১৯
স্বাধীনতা	২০
বই পড়ি	২০

উদ্ভাবনের নতুন দেশ আলোকিত বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

-প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান*

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় এসেছে। বহু ত্যাগ, রক্ত, জীবন আর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙ্গালী জাতির এ- অর্জন বাঙ্গালী জাতি প্রথমে ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছে পরবর্তীতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য প্রতিবাদ করেছে- এর ধারাবাহিকতায় এসেছে মহান মুক্তিযুদ্ধ- পরবর্তীতে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা। এই অর্জন সহজ পথে আসেনি। বিশেষ করে দেশী শত্রুদের বিরুদ্ধাচারন। মুক্তিযুদ্ধের দেশীয় বিরোধীতাকারীরা ছিল সবচেয়ে ভয়ানক। বিদেশী পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে সর্বোতভাবে তার সহায়তা করেছে। মুক্তিবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে বিভিন্নভাবে বিপদে ফেলে মুক্তিসংগ্রামের গতিকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্ করেছে এবং সে চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর '৪৭ (সাতচল্লিশ) বছর পার হয়েছে। জাতি হিসাবে আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বে অনেক সুনাম অর্জন করেছি। কিন্তু যে চেতনাকে বুকে ধারন করে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষ বিনা শর্তে জীবন দিয়েছে- তাঁদের ত্যাগ কি স্বার্থক হয়েছে? তাঁরা কি শুধুই একটি স্বাধীন ভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছেন? তাঁদের লক্ষ কি ছিল? তাঁদের লক্ষ ছিল সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা '৪৭-র পর থেকে লড়েছি তা থেকে মুক্তি পেতে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে- স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে- স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু যে চেতনাকে ধারন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দেশের সংবিধান পেলাম তার চার মূলনীতি আজ ভূলুণ্ঠিত। বার বার সে সংবিধান কাটা-ছেড়া হয়েছে শুধু সুবিধাবাদীদের স্বার্থে- সাধারন জনগণের স্বা উপেক্ষিত থেকেছে। মুক্তিযদ্ধের মূল spirit যে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে পরিত্রান, সাম্প্রদায়িকতা থেকে পরিত্রান, সামাজিক ন্যা বিচার, গণতন্ত্র বার বার হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু এই মূলনীতির মাধ্যমে স্থাপিত চেতনা আজ অবক্ষয়ের পথে। দেশী-বিদেশী স্বার্থন্বেষীরা আজ শকুনের মত খাবলে নেওয়ার চেষ্টায় রত। বিভিন্নভাবে উন্নয়নের গতিপথ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা অতীতে যেম হয়েছে- বর্তমানেও হচ্ছে। এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সাথে একেবারেই যায় না। যারা মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধীতাকারী গণতন্ত্রের দোহায় দিয়ে তাদের সাথে ঐক্যের হালুয়ারুটি ভাগাভাগির চেষ্টা। আসলে সকলের একটাই লক্ষ্য। গণতন্ত্র নয়, উন্নয়নতন্ত্র নয়- শুধুই ক্ষমতার অংশীদারিত্ব। কেউ ক্ষমতায় থেকে চেতনা পরিপন্থী কাজ করছে- কেউ বা ক্ষমতার বাইরে থেকে বার বার যুদ্ধাপরাধীরা ক্ষমতার পালাবদলের সুবিধা নিয়েছে- আর তা শুধু সম্ভব হয়েছে- মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিভক্তির কারণে এটা হয়েছে শুধুই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্বকে কেন্দ্র করে। কোথায় আজ অ-সাম্প্রদায়িক চেতনা বিভিন্ন সমীকরণে ধর্মী রাজনৈতিক চেতনার সাথে আপোষ করা হয়েছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ব্যবহার হচ্ছে ব্যক্তিসম্পর্কের লাভ-লোকসানের জন্য '৭১-র বীর শহীদেরা রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন- এর পর দেশী-বিদেশী চক্রান্তের কাছে দেশকে বিপথগামী করা হয়েছে '৭ সালে। এরপর থেকেই দেশ চলছে এদিক-ওদিক দুলে- কখনোই রেল লাইনের সোজা পথে উঠতে পারেনি। এখন চলছে নতু চক্রান্ত।

লক্ষ্য কি? লক্ষ্য একটাই- ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ- তা সে যুদ্ধাপরাধীর সাথে আপোষ করে হলেও।

তাহলে '৭১- এ এত বড় ত্যাগ স্বীকার কেন?

কিন্তু একথা ঠিক, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না- বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াবেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হবেই। নতু প্রজন্মই তা করে দেখাবে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
সদর দপ্তর, খুলনা।

লোক কবি বিজয় সরকার স্মরণে

বিজয় স্মরনিকা

কে এম আনোয়ারুল ইসলাম*
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক

আমি আজ শুনি কাঁন্দে মানুষ-
বিজয় বিজয় বলে-------
জগজ্জনে ফেলে তুমি
কোথায় চলে গেলে।।

এই পৃথিবী যেমন ছিল
তেমনই ঠিক আছে------
তুমি শুধু নাইরে বিজয়
এই আমাদের কাছে।
তোমার ভালবাসা আজও মানুষ
কখনোই না ভোলে।।

তোমার পঞ্চ সত্ত্বা পঞ্চ ভূতে
মিশে গেছে কবে-------
(তবু) তোমার খ্যাতি যশোদীপ্তি
ঠিকই আছে ভবে।
কায়ায় তুমি না থাকিলেও
আলো অন্তরালে।।

তোমার পোষা পাখী উড়ে যাবে
ভাবোনি তুমি মনে---------
সেই পাখীর মতো তুমিও জানি
উড়িয়ে বিজনে।
তাই, কাঁন্দে তোমার ভক্ত স্বজন
বসে হিজল তলে।।

আনোয়ার আজ ভেবে বলে
তুমি কেন গোপনে-------
লুকালেগো কোন বিজনে----
চিতো চোর পাখীর সন্ধানে।
আছো ওই ডুমদি গাঁয়ের কলমিদলে
শাপলা ফুলে ফুলে।

*লেখক প্রকৌঃ মোঃ খালীদুল ইসলাম খান
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বরগুনা বিদ্যুৎ সরবরাহ -এর পিতা।

মুজিব বর্ষ

মোঃ আরিফুর রহমান*

একটি কণ্ঠস্বর ভেসে যায়
মুক্তির সুবাস হাওয়ায় হাওয়ায়
অনেক দূরের আলোক বর্ষ
মুজিব বর্ষ, মুজিব বর্ষ।।

একটি আওয়াজে বলে যায়
স্বাধীনতার সুবাতাস ছড়ায়।
অনেক জীবনের উৎকর্ষ
মুজিব বর্ষ, মুজিব বর্ষ।।

একটি ডাকে পৃথিবী কাঁপায়
বন্ধনে বাঙ্গালী একই সুতায়
অনেক মিলনের সংস্পর্শ
মুজিব বর্ষ, মুজিব বর্ষ।।

একটি ভাষনে মন হারায়
মহল্লা মহল্লা, পাড়ায় পাড়ায়
অনেক হৃদয়ে একই স্পর্শ
মুজিব বর্ষ, মুজিব বর্ষ।।

*তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওস সার্কেল
ওজোপাডিকোলিঃ, কুষ্টিয়া।

মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধু

মোঃ নাজমুল হুদা

ভূমিকাঃ

"অতঃপর কবি জনতার মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুন ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
জনসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতা খানি।
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

ইতিহাসের বিজয়মালা গলায় পরিয়ে যুগ যুগ ধরে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে বরণ করে নেওয়া মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। জাতিকে রক্ষার জন্য তাঁরা বর্শার সামনে বুঁক পেতে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই একজন ইতিহাসের বরপুত্র। যাঁর শক্তি, সাহস, প্রেম আর দিক নির্দেশনা জন্ম দিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি তিনি। বাংলা মায়ের সোনার ছেলে।

কবি তাই বলেন,

"মায়ের কাছে শুনেছিলাম
শেখ মুজিবের নাম
রক্ত দিলেও শোধ হবেনা
এতই তাঁহার দাম"।
শেখ মুজিবের পরিচয় ঃ
বাংলা মুজিব মুজিব বাংলা
এই তার পরিচয়।
এই বাংলার আকাশ বাতাশ
কানে কানে এসে কয়।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার বাইগার নদীর তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে লুৎফুর রহমান এবং সায়েরা বেগমের ঘরে জন্মনেন শেখ মুজিবুর রহমান। ডাক নাম খোকা। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয়। শৈশব থেকেই হয়ে ওঠেন সকল অন্যায়ের প্রতিবাদকারী। ছাত্রজীবনেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় কারাবরণ করতে হয়। ছাত্রজীবন থেকেই ব্রিটিশ দুঃশাসন, স্বাধীকার চেতনা, পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার, নির্যাতন আর পরিশেষে মনের মাঝে সোনার বাংলাদেশ নিয়ে নিজের স্বপ্নকে ঠিক করেন। ছাত্র জীবনেই যুক্ত হয়েছেন রাজনীতির সাথে। শৈশবে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর পাঠ শুরু করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে। এরপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৮ বছর বয়সে বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে তার বিয়ে হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে

স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সকল আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। সবার নেতা হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়েছেন।

"This may be my last message. From today Bangladesh is independent."

দেশের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ভূষিত হয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু''হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলি, 'বাঙ্গালি জাতির জনক' 'বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা' সহ অনেক উপাধীতে।

৭ মার্চের ভাষনের ইতিহাসঃ

সেই ভোর হতে নীরবে রেসকোর্সের ময়দানে বসে আছি
মার্চ কী দুঃসহ সময়! তবুও আশা শেখ মুজিবুর!
জানি তিনি আসবেন। এই বাংলার মাটি কারও
দখল হতে কেন দেবেন।"

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম। পাকিস্তানের দুটি অংশ-পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য দুটি অংশেরই আলাদা। সেই শুরু থেকেই জোর করে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণদের বঞ্চিত করতে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বৈদেশিক মুদ্রা সর্বক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল সমান বৈষম্য করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলেও ষড়যন্ত্র করে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচুত করে। বার বার শেখ মুজিবুর রহমান সহ দেশের বড় বড় নেতা, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করে। বাক স্বাধীনতাকে হরণ করে পশ্চিমেরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অত্যাচার, নির্যাতন, শোষন করতে থাকে। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু হবার পরও প্রায় চব্বিশ বছর ধরে পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন করা হয়েছে। এরই মাঝে বাংলামায়ের সন্তানেরা একটু একটু করে নতুন স্বপ্নদেখতে শুরু করে। স্বপ্নদেখে বাংলাদেশের, নতুন পতাকার, নতুন শাসকের, নতুন সংবিধানের। এ স্বপ্নের বীজবুনে দিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ মার্চের ভাষনে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষন দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্টীর শোষন-শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙ্গালির সাথে প্রতারনাও বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভুমি তুলে ধরেন। বিশ্ব ইতিহাসে বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব ঐতিহাসিক ভাষণের নজির আছে ৭ই মার্চের ভাষণ তার অন্যতম; পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট এ ভাষণ অমর হয়ে থাকবে। ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে বাঙ্গালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযোদ্ধার নির্দেশনা পায়। এ ভাষনের পরেই বাঙ্গালিজাতির সামনে একটি মাত্র গন্তব্য নির্ধারন হয়ে যায় তা হলো 'স্বাধীনতা'। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ডাক দেন , সে ডাকেই বাঙ্গালি জাতি মুক্তিযোদ্ধার প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ভাষনে পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিক নির্দেশনা ছিল-প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা!

এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলা-কৌশল ও শত্রু মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষন স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালির ওপর আক্রমন চালায় এবং নৃশংস গনহত্যা শুরু করে। বাঙ্গালিরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

৭ মার্চের ভাষনঃ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ কিছু অংশ লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ-

"ভায়েরা আমার----------

সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এ দেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কিভাবে করতে হয়, আমি জানি।

কিন্তু হুঁশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু ঢুকেছে, ছদ্মবেশে তারা আত্মকহলের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোন বাঙ্গালী রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না।

শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা না হলে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রস্তুত থাকবেন, ঠান্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন। আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃংখলা বজায় রাখুন। শৃংখলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না।

আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে, আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

জয় বাংলা

৭ মার্চের ভাষন ও বঙ্গবন্ধুঃ ৭ মার্চের ভাষন বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সনদ। এ ভাষনকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, বঙ্গবন্ধু আমাদের নতুন একটি দেশ নতুন একটি মানচিত্র নতুন পতাকার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ বার্তা দিয়েছিলেন। ৭ই মার্চের ভাষনে ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে শব্দ ব্যবহার করে নতুন রাষ্ট্রের নামকরন চুড়ান্ত করেন। এটা রাজনৈতিক দক্ষতার সাথে বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে তৎকালীন পাকিস্তান নামক দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে কূটনৈতিক দক্ষতাকে মিলিয়েছেন। শুধু তাই নয়, জনগনকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন আসন্ন মক্তুযুদ্ধের। এই মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার কী হবে সে প্রসঙ্গে ও বলেছেনঃ- "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো এছাড়া বলেছেন," আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব' এই ৭মার্চের ভাষনের বিষয়বস্তু ছিল চারটি।

১) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার

২) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া

৩) গনহত্যার তদন্ত করা

৪) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

এই ৭ই মার্চের ভাষনে জাতিকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার আহ্বান করেন। এই ভাষনের শেষ দুটো লাইনই সেই অনুপ্রেরনার উৎস।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম

এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

উপসংহারঃ ইতিহাসের বরপুত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের এই মহান স্বপ্নদ্রষ্টা আজীবন দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। নিজের কথা কখনো ভাবেননি। অথচ আমরাই তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করলাম। হতভাগা মানুষ আপন মানুষকে চেনেনি। মানুষ আজ তাঁর শূন্যতা অনুভব করে। তাইতো কবি বলেন,

"এই বাংলার আকাশ বাতাস
সাগর, গিরি, নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু
ফিরিয়ে আসিতে যদি।"

* ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
ওজোপাডিকো, সদরদপ্তর,
খুলনা।

১৬-ই ডিসেম্বর

শেখ হাবিবুর রহমান*

বিজয়ের সুর লাগে কি মধুর সবার প্রাণে,
মাঠ ঘাট নদী যোদ্ধারা যদি বিজয়টা আনে।
সেই বীর বেশে যোদ্ধারা এসে খুঁজে খুঁজে মরে,
হৃদয়ের ক্লান্তি এনেছে যে শান্তি সকলের দ্বারে।
এ ঘর সে ঘর খোজে বার বার কেবা কাকে চেনে!
কোথা আছে বোন আমার আপন বিজয়ের দিনে।
কোথা গেছে বাবা হায়নার থাবা লেগেছে কি গায়?
ছোট ভাই হারা সেও গেছে মারা মা কে নাহি পায়।
হে মুক্তি সেনা লাগবেনা জানা এসো মোর বুকে,
যুদ্ধের ময়দানে ছিলে তুমি আনমনে কাঁদবেনা দুঃখে।
ত্রিশ লক্ষ ভেঙেছে বক্ষ এ বিজয় আনতে,
দিয়ে বিরতি তবু এত বড় ক্ষতি পারবে কি মানতে?
মানতে যে হবে স্বাধীনতা তবে এমনি তো নয়,
তাজা তাজা রক্ত হয়ে উন্মুক্ত তবু এনেছি বিজয়।
হয়ে গুলিবিদ্ধ তবু শতসিদ্ধ ১৬-ই ডিসেম্বরে,
তাইতো বিজয় নয় পরাজয় করছি আড়ম্বরে।
স্মরণীয় ষোল ব্যথা গুলি ভোলো মনে নাহি ক্লেশ,
আনন্দ উল্লাস হৃদয়ে উচ্ছাস সোনার বাংলাদেশ।

*সহঃ ব্যবস্থাপক (হিসাব) অবঃ, আহিদ,
ওজোপাডিকোলি, যশোর

এগিয়ে চলা

কামরূজ্জামান*

নর পশুদের পরাস্ত করে
বিনিময়ে এসেছে বিজয় মোদের,
এখনো রয়েছে তাঁদের দোসর
বিজয় চায়নি যারা এ দেশের।
নিজের স্বরূপ আড়াল করে
সমাজে তাঁরা অন্য রূপে,
করছে ক্ষতি দেশ ও দশের
দেশ বিরোধী কার্যক্রমে।
বাহ্যিক রূপ যত হোক সুন্দর
অন্তর যদি হয় কলুষিত,
কি বা মূল্য আছে সে রূপের
তাঁর চেয়ে শ্রেয় অসুন্দরের।
সকল গ্লানি ঝেড়ে ফেলে
নতুন রূপে সাজ এবার,
দেশ বিরোধীর মুখোশ খুলে
এই তো সময় এগিয়ে যাবার।
অনেক বেলা হয়ে তো গেল
ঘুম যে মোদের ভাঙেনি আজো,
নতুন দিনের আলোর ছটা
দেখবে সবাই চলো চলো।।

*সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ)
আহিদ খুলনা

ডায়মন্ড

লিটন মুন্সী*

আবার বছর ঘুরে বিজয়ের মাস এসে গেল। সেই ১৯৭১ সন থেকে আজ ২০১৯ সন পর্যন্ত ৪৮ বৎসর, অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে বীর মুক্তি যোদ্ধারা আজ অনেকেই পরলোক গমন করেছেন। আমি তাহাদের আত্মার শান্তি কামনা করি।

যাহা হোক কি লিখি কি লিখি ভাবছিলাম। কারন আমার এই মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী গুলি আমার বাবা-মার কাছ থেকেই বেশীর ভা শোনা। আপনারাতো জানেন যে, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরা ৯ মাস সময় আমার বাবার কর্মক্ষেত্র ছিল ভেড়ামারা বিদ্যুৎ সরবরাহে ভেড়ামারা, কুষ্টিয়াতে বসবাস করতাম। তাই ভেড়ামারা উপজেলার স্মৃতি আমার হৃদয়ে সবসময়ে গেঁথে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কি লিখতে বসলে ভেড়ামারা উপজেলার কথাই শুধু মনে আসে।

আজ আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের এক হৃদয়-বিদারক ঘটনার কথা বলবো। মূল ঘটনা বলার আগে একটু পিছনে যেতে চাই। আমার বাবা দেশের বাড়ী মাগুরা সদরে, বর্তমান সময়ের মত যোগাযোগ ব্যাবস্থা ভাল ছিল না। তাই বাবা বছরে একবার বাড়ীতে যেতেন। আ আমার মা এর বাবার বাড়ী ছিল বরিশাল সদরে। ভেড়ামারা থেকে সুদূর বরিশাল যেতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতো। আমা জানামতে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে আমার মা একবারই তার বাবার বাড়ী গিয়েছিল। চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় ছিল আমাদের পরিবারের জন্য ভেড়ামারা ছিল আত্মীয়-স্বজনহীন একটি জীবন। কিন্তু ভেড়ামারার স্থানীয় মানুষ আমাদের সেই অভা অনেকাংশে পূরণ করে ছিল, তারা আমাদের সাথে ধর্ম-আত্মীয়তা করে। তাই আমার জন্মের পর আমি ভেড়ামারাতে অনেক দাদ দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু পেয়েছি। যারা আমার রক্তের কেউ না হলেও তারা ছিলো আমার নিজ রক্তের আত্মীয় থেকে অনেক বেশ আপন। গুরুজনের আদর ভালবাসা আমি তাদের কাছেই পাই।

অনেক কথা বলে ফেল্লাম, কারণ স্মৃতিচারণ করতে বসলে আমি সেই পুরানো দিনে হারিয়ে যাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমর থাকতাম বোর্ড স্কুল পাড়ায় খোরশেদ শেখ দাদার বাড়ীতে ভাড়ায়। আমাদের বাসাটি ছিল বর্তমানে মার্ক জনি রোড আর ঈদগা রোডের সংযোগ স্থলে। আজকের মত এত লোকজন তখন ছিলনা। বাড়ীগুলি ছিল বড় আর অনেক জায়গা নিয়ে। প্রতিটি বাড়ীতে ছি অনেক ঘর, বড় উঠান, ফলের বাগান আর পুকুর। তেমনি আমার এক ধর্ম দাদা (বাবার ধর্ম চাচা) ছিলেন। তার নাম আমার এখ মনে নাই। তার ছিল বিশাল জায়গা নিয়ে এক বাড়ী। ভেড়ামারা কেন্দ্রীয় ঈদ-গাহের সীমানা আর তাহার বাড়ীর সীমানা ছিল এক বিশাল ফাঁকা জায়গার মাঝে ছিল তার বাড়ী। দাদা ও পরিবারের সকলে কম-বেশী শিক্ষিত ছিল। সেই সময়ে ভেড়ামারার মানুষ প্যান্ট পরতে জানতো না। অধিকাংশ সময়ে লুঙ্গি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি পরে দিন কাটাতো। বিয়ে-শাদী বা ঈদের দিন পাঞ্জাবী-পায়জাম পরতো। কিন্তু সেই সময় আমার এই ধর্মদাদা কোর্ট-প্যান্ট বানাতে পারতেন। আমার বাবাকে তিনি এক সেট ব্লেজার বানিয়ে দিয়েছিলেন। তার সন্তানদের মধ্যে সবার ছোট ছিল এক মেয়ে। বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিলেন "ডায়মন্ড"। মানে আমা ডায়মন্ড ফুফু, আমাকে প্রচন্ড ভালবাসতেন। আমি ছিলাম তার খেলার সাথী। তখন খুব ছোট আমি, কেবল হাটতে শিখেছি। মা যখ রান্নাঘরে দুপুরে কাজ করতেন, বাবা যখন অফিসে,তখন বাসার উঠানে আমি খেলা করতাম। আমাদের বাসার সীমানা হিসাবে ছি তাঁর-কাঁটার বেড়া। ডায়মন্ড ফুফু বাড়ীর পেছন দিয়ে এসে আমাকে ডাকতেন। আমি তার ডাক শুনে তার কাছে গেলে তিনি তারে বেড়া ফাঁক করে আমাকে চুরি করে নিয়ে যেতেন। মা জানতে পারতো না। তখন তার বয়স কতইবা বারো কি তেরো বছর, এক চঞ্চলা কিশোরী। সারাদিন ছটোছুটি করা, গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া আর আমাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ছিল তার খুব প্রিয় চোখে ছিল তার আগামী দিনের রঙ্গিন স্বপ্ন। কারণ গ্রামের মেয়েরা ১৫-১৬ বছর বয়েস হলেই শ্বশুর বাড়ী চলে যেত। আমার সাথে নিয়ে খেলা করতে তার খুব ভাল ভাগতো। বার বার আমাকে চাইলে আমার মা বিরক্ত হবে বকা দেবে এই ভেবে সে আমাকে চুরি করতো। আমাকে সে প্রচন্ড ভালবাসতো, ওই বয়সে তার মধ্যে হয়তো মাতৃত্বের ভাব এসেছিল। আমার মা কাজের ফাকে যখন

খেয়াল করতেন আমি নেই, তখন তিনি সারা পাড়াময় আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরতেন। খুঁজে না পেয়ে ঘরের বারান্দায় বসে পা ছড়িয়ে কাঁদতেন। আশে-পাশের প্রতিবেশী বিশেষ করে আমাদের বাড়ীওয়ালা খোরশেদ দাদার পরিবার এসে আমাকে খুঁজে পেতে মাকে সাহায্য করতেন। দুপুরে বাবা খেতে এসে সবকিছু জানার পর তিনিও আমাকে খুঁজতে বের হতেন। কিন্তু কেউই আমার খোঁজ দিতে না পারায় আমার মায়ের দুঃচিন্তা চরম পর্যায়ে পৌঁছাইতো। ও বলায় হয়নি আমি হচ্ছি আমার বাবা-মার প্রথম সন্তান। দুপুর গড়িয়ে গেলে ডায়মন্ড ফুফু আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে যেত। তখন আমার মা ফুফু কে আচ্ছা রকম বকুনি দিয়ে বলতো ছেলে নিয়ে গেছিস, আমাকে বলে নিয়েছিস ? এখন ফেরত দিচ্ছিস কেনো ? ফুফু বলতেন তোমার ছেলে ক্ষুদায় না কাঁদলে ফেরত দিতাম নাকি ? এমনই ছিল আমাদের সাথে ফুফুর সম্পর্ক। মিষ্টি মধুর পবিত্র এক সম্পর্ক।

১৯৭১ সাল চারিদিকে যুদ্ধের দামামা বাজছে। হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিরীহ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। চারিদিকে শুধু মৃত্যু আর মানুষের আহাজারী। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ওরা পুলি করে মারছে। বাড়ী-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সাধারন মানুষ প্রান ভয়ে একটু আশ্রয়ের আশায় পালাচ্ছে। ডায়মন্ড ফুফুর বড় ভাই বাবলু কাকা সবে মেট্রিক পাশ করে বের হয়ে কিছুদিন মুজাহিদ ট্রেনিং (বর্তমানে আনসার ট্রেনিং) গ্রহণ করেন। পরে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহন না করলেও তার বন্ধুরা যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সহযোগিতা করতেন। এর মধ্যে তার বিয়ে তারই এক চাচাতো বোনের সাথে ঠিক করা হয়। কিন্তু যুদ্ধের কারনে বিয়েটা আর হয়নি। একসময় তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহনের সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক এমন সময় পাক-হানাদার বাহিনী ভেড়ামারা উপজেলা এলাকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালানোয় বাধ্য হয়ে তিনি তার পরিবারসহ গ্রামের দিকে নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছিলেন। আমরাও বাদ যাইনি, প্রাণ বাঁচানোর জন্য একদিন ভোরে আমরাও ঘর ছাড়লাম। পিছনে ফেলে গেলাম আমার বাবা-মায়ের কষ্টের টাকায় তিল তিল করে তৈরী করা সংসার। আমরা যুদ্ধের পর ফিরে বাসায় এসে পোড়া কয়লা আর ছাই ছাড়া কিছু পাইনি। পালানোর সময় চাঁনগ্রাম নামে এক গ্রামে বাবলু কাকা, ডায়মন্ড ফুফু তাদের বাবা-মাসহ আত্মীয়স্বজন যখন উপস্থিত হয়। তখন সেখান দিয়ে পাক-বাহিনীর একটি দল গাড়ীতে করে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এলাকা অতিক্রম করছিল। ডায়মন্ড ফুফুর বাবা মানে আমার দাদা তার পরিবারসহ সকলকে তাড়াতাড়ি একটি নালার মধ্যে আশ্রয় নিতে বলেন। আনুমানিক প্রায় ৮ থেকে ১০ জন লোক সেখানে ছিল। আরো ছিল দুগ্ধ-পোষ্য শিশুও। নালাটি শুকনো থাকায় তারা নালার মধ্যে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে রুদ্ধ শ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন গাড়ীটি বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় ছিলনা। একটি শিশু তার মায়ের কোলের মধ্যেই কেঁদে ওঠে। আর যা হবার আর তাই হলো। শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে হানাদার বাহিনী থমকে দাড়িয়ে পড়লো। তারা নালার দিকে তাঁকিয়ে দেখে অনেক মানুষ সেখানে শুয়ে আছে। তারা মনে করলো মুক্তি বাহিনী। তাদের গাড়ীতে লাগানো ভারী মেশিনগানটি দাদার পরিবারের দিকে তাক করলো। দাদা যখন বুঝলেন আর রক্ষা নাই তখন তিনি পাগলের মত দুই হাত শুন্যে উঠিয়ে চিৎকার করে তাদের থামতে বলেন, তিনি তাদের এও বলেন যে, তারা মুক্তিযোদ্ধা নন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভারী মেশিনগানের শব্দে তার সেই আর্ত-চিৎকার স্তব্ধ হয়ে যায়। তার মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টির মত ছুটে আসা বুলেট সে দিন আমার দাদার পরিবার আর সেখানে উপস্থিত সকলে একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। আমার প্রিয় সেই মিষ্টি ডায়মন্ড ফুফুরও হানাদারদের ছোঁড়া নির্মম ভারী মেশিন গানের বুলেটের আঘাতে তার ছোট্ট দেহটি ঝাঁঝড়া হয়ে যায়। রক্তের নদী নালা দিয়ে বয়ে যায়। চির দিনের জন্য থেমে যায় তার সেই চঞ্চলতা, হারিয়ে যায় একটি রঙ্গিন স্বপ্নের। বাবলু কাকা গুলিবিদ্ধ হয়ে সারারাত মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে এক সময় তিনিও মৃত্যুর কাছে হেরে যান। বাবলু কাকার হবু স্ত্রী বাবলু কাকার হাতটি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ধরে রেখে ছিলেন। হানাদার বাহিনী কিন্তু দাদাকে মারে নাই, ছেড়ে দিয়ে যায়, হয়তো বুকফাটা আর্তনাদ আর দুঃসহ স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াবার জন্যই। ঘটনাটি জানার পর সারা ভেড়ামারার মানুষ দীর্ঘ দিন কেঁদেছে। আমার মা-বাবাকেও দেখেছি অনেক দিন কাঁদতে।

আজ আমরা ৩০ লক্ষ প্রাণ আর ২ লক্ষ মা-বোনের সম্মান আর ইজ্জতের বিনিময়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। এমনই লক্ষ লক্ষ কাহিনী নিয়েই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদকে সঙ্গে করেই আমাদের মুক্তি এসেছে। এ বিজয় কেউ আমাদের এমনি এমনি দেয় নাই। আমরা দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে আমাদের প্রিয়জনের আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই বিজয় অর্জন করেছি। তাই আমরাও আমাদের সকল কিছুর বিনিময়ে এই বহুমূল্য বিজয়কে ধরে রাখতে হবে। তবেই হবে আমাদের দেশের প্রতি আমাদের প্রকৃত ভালবাসা প্রদর্শন।

* সিনিয়র হিসাব সহকারী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকোলিঃ, খুলনা।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পিতা-মাতার ভূমি

ক্যাডেট নওশীন হুদা

ভূমিকাঃ 'মাদক' নামক কালসাপের তীব্র দংশনে বাবা মায়ের সামনে ছটফট করতে করতে চিরতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে হাজা সন্তান। এসব সন্তানদের বাবা মায়ের জীবন সংগ্রাম হারমানায় ম্যক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের মা-কে কিংবা মানিক বন্দোপা 'জননী'-বা জননীকে তবুও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে তাদের সংগ্রামের কোনো শেষ নেই! শত অপমান, কষ্ট সহ্য করে কোনে বাবা মা সন্তানকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য মাদকাসক্তি নামক বর্শার সামনে বুক পেতে দিয়েছেন। কোনো কোনো নীরবেই সহ্য করে যান আর কেহ বা তাদের সন্তান সম্পর্কে খোঁজই রাখেন না।

মাদকাসক্তি কী ঃ মাদকাসক্তি বলতে মাদকের প্রতি আসক্তিকে বোঝায়। মাদক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মাদক বা ড্রাগ বিষাক্ত ছোবলের মতো যা প্রতিনিয়ত একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে তার দংশনে শেষ করে দেয়। মাদক দ্রব্য স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর কিরুপ প্রভাবে ফেলে আসক্তি সৃষ্টি করে। মাদকদ্রব্যে বেদনানাশক কর্মের স থাকে তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মেজাজ পরিবর্তন, মানসিক আচ্ছন্নতা ও রক্তচাপ পরিবর্তন ইত্যাদি।

কবির ভাষায় ঃ-

"করিলে মাদক সেবন
আসবে নেমে মহা মরণ
ছেড়ে দে ওসব তুই
আজও বুঝিলিন রে মন।।"

সন্তানের জীবনে মাদকের বিস্তারঃ বিশ্ববাসী মাদকের ভয়াবহতা যেভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে তা কল্পানাতীত। ফুলের মতো নিষ্পাপ স জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। যে শিশু গর্ভে আসার আগে থেকেই বাবা-মা স্বপ্নের পাহাড় গড়ে তোলে তা নিমি করে দেয় এই মাদকাসক্তি। কখনো কখনো বাবা মায়ের টাকা চুরি করে ইয়াবা সেবী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রচলিত এ "ইয়াবা স্মার্টের প্রতিক। খাও আর স্মার্ট হও।" রাতে বাংলাদেশের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফাঁকা মাঠগুলো হ ইয়াবাসেবীদের আড্ডাখানা। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় রাতে বের হলেই দেখা যায় সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে কোথায় যে ফেলে।

সন্তানেরা জীবনে মাদকের বিস্তার এত ভয়াবহ যে, বর্তমানে মাদকাসক্ত হয়ে সন্তান বাবা -মাকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ যার প্রমান বাংলাদেশের "ঐশী!" যে বাবা-মা নিজেদের সর্বোচ্চটুকু প্রচেষ্টা সন্তানের মঙ্গল কামনায় নীরবে করে যান, তাঁদের করতেও এতটুকু হাত কাঁপেনি।

"মাদকাসক্ত ছেলের হাতে বাবা খুন" এমন শিরোনাম পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়। বৃদ্ধ বাবাকেও অত্যাচার করতে এতটুকু কোনো বাবা-মা নীরবেই সহ্য করে যান কেহ বাধা হয়ে সন্তানের নামে মামলাও করেন।

পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিদিন ১০ জন নতুন করে মাদকাসক্ত হচ্ছে। বর্তমানে কিছু কিছু সন্তানের কাছে পানির জায়গায় জীব নাম সিগারেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি 'জনে ৮ জন সিগারেট খায় মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পিতামাতার ভূমিকা দি এজন্য গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পিতামাতার ভূমিকাঃ সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের ত্যাগের অন্ত নেই। সন্তান যখন বিপথে চলে যায়, ইয়াবা সম্রাট হয়ে ওঠে, মাদকের নেশায় মৃত্যুর পথে গমনকে মাদকের নেশা থেকে বাঁচাতে বাবা মায়ের ভূমিকাই মূখ্য।

* প্রতিটি বাবা-মাকে সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে। পৃথিবীতে কোনো ধর্মই মাদককে গ্রহন করে না। বর্তমানে আধুনি

পেছনে ছুটতে ছুটতে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুরাই মাদকাশক্তি হয়ে ওঠে।

কাজেইঃ

* সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে।

* তাদেরকে সময় দিতে হবে।

* তাদের সামনে সাংসারিক ঝগড়া বা বিবাদ করা যাবে না।

* সন্তানকে মাদকমুক্ত করতে হলে বাবাকে মাদকমুক্ত হতে হবে কারন, যে বাবা নিজে সিগারেট খায় তার সন্তানও সিগারেট খাবে এটাই স্বাভাবিক।

* সন্তানকে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া যাবেনা। ধনী পিতা-মাতাকে এ বিষয়ে বেশি সচেতন হতে হবে।

* বলা হয় "সঙ্গদোষে লোহা ভাসে" সন্তানেরা অধিকাংশই বন্ধু নির্বাচনে ভুল করে। আর ভুলের মাশুল হিসাবে নিজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বাবা-মাকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

* সন্তানের চাওয়া-পাওয়া, বাবা-মাকে বুঝতে হবে। সন্তানের স্বপ্নকে ভেঙ্গে তাদের স্বপ্ন সন্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

উপসংহারঃ "প্রনামিয়া পাটনী কহিছে জোড় হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে
তথাস্ত বলিয়া দেবী দিলা বরদান
দুধে ভাতে থাকিবে তোমার সন্তান।"

কিন্তু বাস্তবতা হলো, বর্তমানে দুধ ভাতের চেয়ে মাদক বেশি প্রচলিত। এমনও নজির আছে জনগণ দুধ বিক্রির টাকায় ধুমপান করে। সন্তানের জীবন বাঁচাতে তাই প্রতিটি বাবা-মাকে সচেতন হতে হবে। নইলে সে সন্তানকে নিয়ে যে স্বপ্নের জাল বুনেছিল তা নিমিষেই ছিড়ে যাবে।

*পিতাঃ মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), ওজোপাডিকো, খুলনা।

চিত্র ঃ "বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশ"

*আবৃত্তি রহমান রোজা

* পিতাঃ মোঃ আরিফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওস সার্কেল, ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

কুরআনের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ক

মোঃ আবুল কালাম (বীর মুক্তিযোদ্ধা ৯নং সেক্টর)*

তোমার প্রতি পালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতিত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি ভাল ব্যবহা তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের প্রতি বিরক্ত, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও কোন কথা বলো না বরং তাদের সাথে সম্মান সুচক কথা বলবে। তাদের প্রতি মমতা ও নম্রতার সাথে কথা বলবে। আরও আমাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দয়া কর যে ভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন পালন করেছেন।" (সুরা বনি ইসরাইল ২৩-২৪)

ইমাম করতুবী বলেন-এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাদের সাথে ভালব্যবহার করাকে আল্লাহ এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করেছেন।

এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাস করলেন মাতাপিতার প্রতি সন্তানের হক কি-তিনি বললেন তারা উভয়ই তোমার জান্ন জাহান্নাম। পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে বেয়াদবী ও অসন্তুষ্টিতে জাহান্নামে পৌঁ (ইবনে মাযাহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্নিত রাসুল (সাঃ) বলেন-"সেবা যত্নকারী কোন সন্তান পিতা-মাতার দিকে যদি দয়া ও সহকারে দৃষ্টিপাত করে তবে তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব পাবে। লোকেরা আরজ ক রাসুলুল্লাহ সন্তান যদি দিনে ১০০ বার দৃষ্টিপাত করেন তা হলে? তিনি বলেন তা হলে ঐ সন্তান ১০০টি কবুল হজ্জের সওয়াব

সহী বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্নিত জনৈক এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) এর নিকট জেহাদে যাওয়ার চাইলেন। রাসুল (সাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞাস করলেন তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বললেন জিহ্যাঁ তারা জীবিত রাসুল (সাঃ) বললেন তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবা যত্নে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেই জেহাদের সাওয়াব পাবে।

পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তারা সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তাদের জীবন সন্তানের দয়ার উপর নির্ভরশীল হ তখন যদি সন্তানের পক্ষ হতে সামান্যতম অবহেলা ও বিমুখতা প্রকাশ পায় তাহলে তাদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়।

আজ পিতা-মাতা তোমার যতটা মুখাপেক্ষী একসময় তুমিও তদপেক্ষা বেশী মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেমন নিজেদে আয়েশ তোমার জন্য কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুজ কথাবার্তাকে তাদের স্নেহ, মমতার আবরনে ঢেঁকে দিয়েছিলে মুখাপেক্ষীর এ দু:সময়ে তোমার বিবেক ও সৌজন্য বোধের তাগিদে পুর্ব ঋন শোধ করা সন্তানের কর্তব্য।

বোখারী শরীফে বর্নিত, হযরত আসমা (রাঃ), রাসুল(সাঃ) কে জিজ্ঞাস করলেন আমার "মা" একজন মুসরিকা সে আম আসেন তাকে আদর আপ্যয়ন করা জায়েজ হবে কি? তিনি বললেন অবশ্যই তোমার মাকে আদর আপ্যয়ন করবে।

হযরত আবু উসায়দ (রাঃ) বর্নণা করেন রাসুল (সাঃ) এর নিকট একজন আনসার জিজ্ঞাস করলেন পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কোন হক আমার আছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ-তাদের জন্য দোয়া, এস্তেগফার করা, তাদের ঋন থাকলে শোধ করা, কারো সা অংগীকার থাকলে তা পুরণ করা এবং পিতা-মাতার আত্মীয় স্বজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করা ও সম্পর্ক বজায় রাখা।

আল্লাহ তায়ালার এবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য, সেবাযত্ন সর্বাদিক গুরুত্বপুর্ণ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া অতীব জরুরী। তাই কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতা-মাতার প্রতি ও কর্তব্য পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

সুরা বাকারা ২৮৫-২৮৬: "আ-মানাররাছুলু বিমাউনঝিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনূনা কুল্লুন আ-মানা বিল্লাহি
মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহী লা-নুফাররিকুবাইনা আহাদিম মির রুছুলিহী ওয়া কা-লু ছামি'না ওয়াআতা'না গুফরা-ন
রাব্বানা-ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

লা-ইউকাল্লিফুল্লা-হু নাফছান ইল্লা-উছ'আহা-লাহা-মা কাছাবাত ওয়া-আলাইহা-মাকতাছাবাত রাব্বানা লা-তুআ-খিজনা ইননাছিনা-ও
আখতালনা-রাব্বানা ওয়ালা-তাহমিল 'আলাইনা-ইসরান কামা-হামালতাহূ অলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা-রাব্বানা-ওয়ালা তুহাম্মিলনা-
লা-তা-কাতা লানা-বিহী ওয়া'ফু'আন্না-ওয়াগফিরলানা-ওয়ারহামনা-আনতা-মাওলা-না-ফানসুরনা- আলাল কাওমিল কা-ফিরীন।"

অর্থ:- আল্লাহ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দ্বায়িত্ব অর্পন করেননা যাহা তাহার সাধ্যতীত। সে ভাল যাহা উপর্জন করে
তাহারই। আর সে মন্দ যাহা উপর্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই। হে প্রতিপালক যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে
আমাদের পাকরাও করিও না । হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের পুর্ব পুরুষদের উপর যে গুরু দ্বায়িত্ব অর্পন করিয়াছিলে আমা
উপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করোনা। হে আমাদের প্রতিপালক এমন ভার আমাদের উপর অর্পন করোনা যাহা বহন করার শক্তি আম
নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কা
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত কর।

*সহকারী প্রকৌশলী
সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড প্রোটেকশ
ওজোপাডিকোলি: খুলনা।

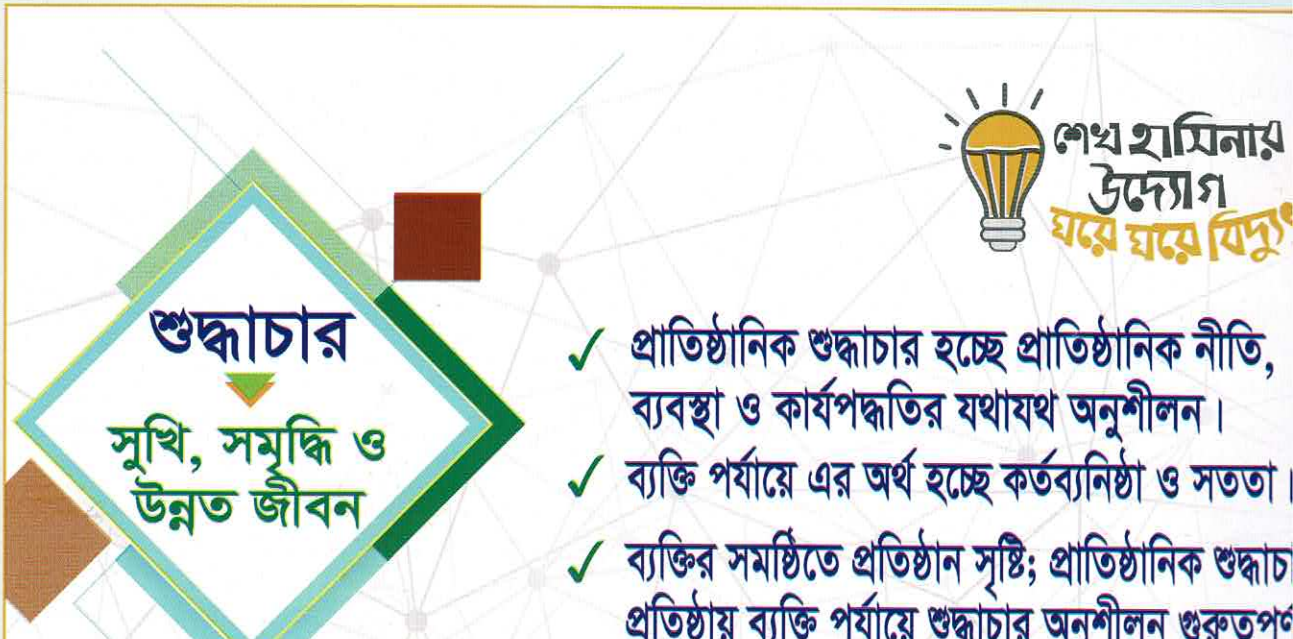

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ আবুল বাশার

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, একটি ফুলের জন্যে মোরা অস্ত্র ধরি .../ লাল সবুজের দেশ বাংলাদেশ, ঐতিহ্যের দেশ বাংলাদেশ, যে-দেশের রক্তাক্ত ইতিহাস আছে- সে ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীনতা সহজভাবে আসেনি। ১৯৭১ সালে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতির বিনিময়ে আমরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা পৃথিবীর কোনো জাতিই এত কম সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

তবে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বেদনার ইতিহাস হলেও তা গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর। তাই দেশপ্রেমের ভট্টাচার্যের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে

'সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার / তবু মাথা নোয়াবার নয়।'

স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলাদেশ ছিল পরাধীন এবং বাঙালিরা ছিল শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। রূপসী বাংলার রূপ-ঐ ধন-সম্পদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশিদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রায় দুই শত বছরের ইংরেজ শাসনের করে ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে জানা হয় স্বাধীন পাকিস্তানের। পূর্বপাকিস্ত বাংলাদেশ ছিল স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ। কিন্তু মূলত তখনও আমরা বাঙালিরা প্রকৃত স্বাধীন হতে পারিনি। কা শাসকদের একরোখা শাসননীতির ফলে আমরা ছিলাম শোষিত। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম বঞ্চি ভাষা ও সংস্কৃতিকে তারা স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ছাত্র-জনতা তা মেনে নেয়নি। প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এদেশের আপামর জনসাধারণ। এই অশুভ ষড়যন্ত্রের বিরু সজাগ ছিল বলেই ক্রমাগতভাবে একটা প্রতিরোধ গড়ে ওঠে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে এই প্রতিরোধ স্বাধীনতা-সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পর থেকেই মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে রোধ করার জন্যে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৫২ সালে পুনরায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দিলে ছাত্র জনতা পুনরায় বিক্ষোভে ফেটে সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্যে গুলি চালানো হয়। শহীদ রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরও অনেকে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের অভূতপূ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান নির্বাচন দিয়ে এদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। তখন থেকেই স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন তী বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপিত হয়। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষ সাজিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে আটক করা হয়। কিন্তু গণআন্দোলনের মুখে তাঁকে আটকে রাখা সম্ভব হ ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের ছেড়ে দেয়া হয় এবছর তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হ তালবাহানা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে এ

স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' বলে জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। সারা বাংলায় হয় তুমুল আন্দোলন। আপোস আলোচনার নামে কালক্ষেপন করে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে সৈন্য ও অ এনে শক্তি বৃদ্ধি করে; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের গভীর রাতে পাক ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ইপিআর ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নি হত্যাযজ্ঞ চলে।

পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের মুখে জ্বলে ওঠে সারা বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জনাব তাজউদ্দিন আহামেদ এর আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি প্রবাসী সরকার মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। এই সরকার গঠনের মধ্য দি হয় মুক্তিসংগ্রাম।

পঁচিশে মার্চের রাতের অন্ধকারে হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত জাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ছাব্বিশে মার্চ। সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণা দেন। আহ্বান বাঙালি সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে। পাকবাহিনী তখন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চ অসহায় বাঙালিরা দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সে জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এ দেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, ই ইপিআর, আনসার ও সামরিক-বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। পাক-বাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ক পড়ে তারা। যতই দিন যেতে থাকে ততই সুসংগঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের রীতি অবলম্বন করে শত্রুদের বি করে। বিশাল শত্রুবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়েও মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলায় সক্ষম হচ্ছিল না। দেশের মধ্যে মু রাজাকার আলবদর ছাড়া সমুদয় দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে লাগল। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশের ভিতরে নি শত্রু হনন করা সম্ভব হচ্ছিল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি সংগ্রাম চরমরূপ ধারণ করে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ ব্যাপকতর থাকে। আর শত্রুবাহিনীও সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে।

মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানীদের অবস্থান দুর্বল হয়ে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার পাকবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমার্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ১ মিনিটে ঢাকায় রমনা রেসকোর্স ময়দানে-- বর্তমান সোহরা উদ্যানে যৌথ কম্যান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নি পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।

দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আজ আমাদের দায়িত্ব, এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করা। কবির আহ্বান তাই আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায়-

Build it again, / Great child of Earth
Build it again / With a finer worth.
In thine own bosom build it on high! / Take up the life once more.'

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭১ সালে আমরা যে আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তখনি সাফল্যে উদ্ভাসিত হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হবে। সেই লক্ষ্যে আজ সমাজের সর্বস্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ছড়িয়ে দেয় প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের মহৎ লক্ষ্যসমূহ জাগ্রত করা গেলে, তবেই আ স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এক গৌরবময় স্তরে উত্তীর্ণ হবে।

* চিকিৎসা সহকারী
ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি
বয়রা বিদ্যুৎ ভবন, খুলনা।

"সোলার নেট মিটার ব্যবহারে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে সবার ঘরে"

স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করি

- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করলে ঘরে বসেই বিদ্যুতের ব্যবহার জানা যাবে ।
- ঘরে বসেই স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারে মোবাইল এ্যাপস্ এর মাধ্যমে রিচার্জ করে বিদ্যুৎ সংযোগ সচল রাখুন।
- আপনার পরিবারের বাজেট অনুযায়ী পূর্ব থেকেই মিটারে বিদ্যুৎ ব্যবহার নির্দিষ্ট করা যাবে। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে আপনাকে সাহায্য করবে।
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার শর্ট সার্কিট জনিত দূর্ঘটনা রোধ করে গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিরাপদ রাখে।
- মিটার রিডিং ভুল ভ্রান্তি জনিত বিল হতে রক্ষা পেতে আজই স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করুন।
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব মাশুল থাকবে না।
- মিটার প্রতিস্থাপনের সময় প্রতি গ্রাহককে অপারেটিং ম্যানুয়াল প্রদান করা হয়। ফলে গ্রাহকগণ সহজেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন।
- মিটারে ব্যালান্স শেষ হয়ে গেলে তাৎক্ষনিকভাবে মিটার হতে অগ্রীম ব্যালান্স নেয়ার ব্যবস্থা আছে, ফলে বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।
- সাপ্তাহিক ছুটি, সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পরে (বিকাল ৪:০০ টা থেকে পরদিন সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত) মিটারে ব্যালান্স না থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার নিশ্চিত করুন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করুন।

ওজোপাডিকো সদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)
Bidyut Bhaban, Boyra Main Road, Khulna-9000, Bangladesh
Tel : + 880-41-811573, 811574, 811575, Fax : +880-41-731786
E-mail : md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com

মুঃ গ্লোরি, খুলনা ০১৭১১ ২৯ ৬৬ ১৯